নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ ১-১০
© ১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নৃবিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মানস চৌধুরী*

ভূমিকাঃ কিভাবে নৃবিজ্ঞান?

উপনিবেশকারী শক্তির সাথে নৃবিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং বেড়ে ওঠার সম্পর্ক, সেই উপনিবেশকারীর মদদদাতা হিসেবে নৃবিজ্ঞানীর ভূমিকা - এগুলো আর অপরিচিত আলাপ নয় এখন।[১] কিন্তু, শুধু এসমস্ত সম্পর্কে জ্ঞাত থাকাই তৃতীয় বিশ্বের প্রান্তিক পুঁজিবাদী[২] একটা দেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব ও দায়িত্ব তৈরীতে যথেষ্ট ভূমিকা নয়। যেহেতু এই সমস্ত আলাপ হচ্ছে খোদ নৃবিজ্ঞানের মধ্যেই, এবং যেহেতু পশ্চিমের নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যেই এ নিয়ে আলাপ-আলোচনা-বিতর্ক চলছে আর পশ্চিমের প্রকাশনা বিশ্ব জুড়ে শিক্ষাজগতে একচেটিয়া আধিপত্য তৈরী করে রেখেছে, এবং যেহেতু অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসরগুলো খুবই শ্লথগতিতে হলেও শেষমেশ নতুন লেখালেখির, অবশ্যই পশ্চিমের, কিছু জায়গা করে দেয়, তাই এ সম্পর্কে জানাশোনা থাকা এ দেশীয় পরিসরে অনেক বড় কিছু করে ফেলা নয়। তাগিদটা বরং আরও গুরুতর।

বাংলাদেশের মত একটা দেশে নৃবিজ্ঞান চর্চার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য দাঁড় করানোতে, জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞানের পরিধি তৈরীতে ঐ উপলব্ধি কী ভূমিকা রাখবে - সেটাই প্রধান জিজ্ঞাসা। ঐ উপলব্ধি, অর্থাৎ নৃবিজ্ঞানের বেড়ে ওঠার সাথে বিরাট পশ্চিমের, দাপুটে উপনিবেশকারীর, সম্পর্কের উপলব্ধি। ঐ উপলব্ধি তাই অনিবার্যভাবেই ইতিহাসের উপলব্ধি। কিন্তু সে ইতিহাস কেবলমাত্র নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস নয়। এমন কি সূক্ষ্ম এবং সঠিকভাবে বললে বাংলাদেশের ইতিহাসও নয়। ইতিহাস হচ্ছে খোদ পশ্চিমেরই। পশ্চিমের জ্ঞানের। পশ্চিমের ক্ষমতার। পশ্চিমের বিস্তারের।[৩] যে তাগিদে পশ্চিমের ইতিহাসের মধ্যকার বিষয় হিসেবে নৃবিজ্ঞানকে চেনা সম্ভব সেই তাগিদটা ব্যাপক অর্থে রাজনৈতিক। পশ্চিমের ইতিহাসের অংশ হিসেবে নৃবিজ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারাটা রাজনৈতিক। পশ্চিমকে চিনতে পারা (এবং চাওয়া) রাজনৈতিক। আবার পশ্চিমকে না চিনতে পারাও (এবং না চিনতে চাওয়া) রাজনৈতিক। প্রথমটা রাজনৈতিক, কারণ ওই চেনার মধ্য দিয়ে পরিসরের ওপর পুনর্দখল রচনা করা সম্ভব। তাই সেটা লড়াই অর্থে রাজনৈতিক। দ্বিতীয়টা আপাতঃ 'অরাজনৈতিক' মনে হতে পারে, 'নিরপেক্ষ' মনে হতে পারে। সেটা 'অরাজনৈতিক' নয়, 'নিরপেক্ষ' ও নয় - বরং লড়াই বিরোধী। প্রবলের পক্ষে নুলা জ্ঞান উৎপাদক। তাই তা 'প্রশমনকারী রাজনৈতিক'।

---

* সহকারী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সামাজিক বিজ্ঞানের প্রধান ও প্রবল ধারাকে চেনা এবং সেই চেনার মধ্য দিয়ে তার বদল ঘটানোর তাগিদ ঘটেছে। ঘটেছে পশ্চিমেও। প্রধান ধারার বিকল্প গড়ার চেষ্টা হয়েছে। স্পষ্টতই, জ্ঞানের কেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়ায় বিকল্প নির্মাণের প্রচেষ্টা কোন এক ভাবে লড়াকু।

বিকল্প, কিন্তু রাস্তা নয় আমাদের

আম্বার্তো ইকো একটা গল্প বলেছিল। গল্পটা হচ্ছে ঃ কিছুকাল আগে একদল ফরাসী নৃবিজ্ঞানী আমন্ত্রণ করেছিলেন আফ্রিকার কিছু গবেষককে । উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার গবেষকরা যাতে ফরাসী জীবন যাপনের চালচিত্র বুঝতে পারেন। আফ্রিকার ঐ গবেষকগণ খুবই বিস্মিত হলেন (মজাই পেলেন) যে ফরাসী লোকজনের রাস্তায় কুকুর হাঁটানোর বাতিক আছে। গল্পটি ইকো আমাদের বলে ওর 'ভ্রান্তপঠন' (misreadings) বইটির মুখবন্ধতে (Eco 1993)।[৪] গল্প ছিলনা এটি। ইতালীয় ভাষার লেখক তার 'দ্য এন্ড ইজ এ্যাট হ্যান্ড' লেখাটি নিয়ে বলতে গিয়ে গল্পটি শোনায়। বলে যে এ লেখাটি ওর ফ্রাঙ্কফুর্ট ধারায় অনুপ্রাণিত এবং 'বিকল্প নৃবিজ্ঞান' বলে যা বলা হয় সেই গোছের কিছু একটা লেখার অনুশীলন ছিল ওটা।

ইকো নৃবিজ্ঞানী নয়।[৫] কিন্তু, বিকল্প নৃবিজ্ঞান বলতে যা বোঝানো হয় তার সাথে এই গল্পটা প্রাসঙ্গিক। ইকো বিকল্প নৃবিজ্ঞানের একটা সংজ্ঞা বা ধারণাও দাঁড় করিয়েছে। '' 'অন্যদের' জগৎ যেভাবে 'আমরা' দেখি তা নয় বরং 'আমাদের' জগৎ যেভাবে 'অন্যে'রা দেখে'' (ইকো ১৯৯৩:৪)। দেখবার চোখের এই পল্টান দেবার প্রকল্পকে কেবল বিকল্প বলাই যথেষ্ট নয়, তা রীতিমত বৈপ্লবিক। প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানকে তা প্রশ্ন করে, ভিত্তিকে নাড়িয়ে দেয় তার। প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের ক্ষমতাকে নড়বড়ে করে দেয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও বিকল্প নৃবিজ্ঞানের এই ধারণা আমাদের 'নিকট-সম্পর্কের' মনে হয়না। আমাদের জন্য অর্থপূর্ণও নয় তা। সেটাও ঐতিহাসিক কারণেই। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাস এবং পশ্চিমের ইতিহাস।

তৃতীয় বিশ্বের সমাজে বসে নৃবিজ্ঞানের একমাত্র অর্থ এবং পরিচিতিই হচ্ছে অন্যদের চোখে দেখা 'আমাদের জগৎ'। এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি কখনোই ঘটেনি এবং এখনও প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যে জ্ঞানভান্ডার প্রতিষ্ঠিত, পরিচিত এবং অবশ্যপাঠ্য হিসেবে রয়েছে তা প্রান্তস্থ সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান। আর অনিবার্যভাবেই তা কেন্দ্রস্থদের দেখা বা উপলব্ধি করা জ্ঞান। অন্যদের দেখা 'নিজেদের জগৎ'এর অর্থ, যেখানে জ্ঞানকান্ড হিসেবে নৃবিজ্ঞান বিকাশমান সেখানে, স্পষ্টভাবে দ্বিবিধ। প্রথমতঃ সত্যিকার পশ্চিমা গবেষকদলের পয়দা করা জ্ঞানের এক বিশাল ভান্ডার। 'নিজ' সমাজ সম্পর্কে যে ভান্ডারটির গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। দ্বিতীয়তঃ 'নিজ' সমাজ হতেই প্রশিক্ষিত গবেষকদলের পয়দা করা জ্ঞান, চালে ও চলনে, প্রজ্ঞা ও বিশ্লেষণে যা সবিশেষ পশ্চিমা সমরূপ। সেই সব চিন্তা ও প্রত্যয়

এসব কাজে অনুশীলিত যা ইতোমধ্যেই ফর্মুলা আকারে অপশ্চিমকে বুঝতে পশ্চিম বানিয়ে দিয়ে রেখেছে।[৬]

গার্ডনারের নদী প্রান্তঃ কেন্দ্রস্থ গবেষকের বঙ্গদর্শন

গার্ডনার সুলেখক। প্রথাসিদ্ধ নৃবিজ্ঞানে 'ফিল্ড ডায়েরী' বলে যা পরিচিত, সেটাকেও অসাধারণ সুখপাঠ্য এক গ্রন্থে রূপদান করা সম্ভব হয়েছে ওঁর পক্ষে।[৭] নামটিই নাড়া দেয়। 'নদী প্রান্তে সঙ্গীতমালা'। নৃবিজ্ঞানের ইতিহাসে অবশ্য এই উদাহরণ নতুন নয়। ম্যালিনোস্কীও তাঁর রোজনামচাকে প্রকাশনা সাহিত্যরূপ দিয়েছিলেন, যেটা খুবই আলোচনা তুলেছিল (Malinowski 1967)। স্পষ্টতঃই সমকালীন গবেষক ও লেখক। কেটি গার্ডনারের গুরুত্ব একদম ভিন্ন। কারণ, প্রকাশনা জগতের সাম্প্রতিক বিবিধতার কারণে পাঠকের জন্য নানান মন-পছন্দ্ বিষয় থাকবার পরও তাঁর লেখার জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা এতটুকু ক্ষুন্ন হয়না। সংকলনটিকে প্রকাশক বলেছেন ভ্রমণ আত্মকথা। লেখকও বলেছেন গাঁথা বা কাহিনী। কিন্তু, ভুলে গেলে চলছেনা যে, এই গাঁথার উপজীব্য যে স্হান, সিলেটের এক গ্রাম যাকে-ঘিরে এই আত্মকথা আবর্তিত, সেই একই স্হান লেখকের গবেষণার মাঠকর্মেরও জায়গা। তাই বিযুক্ত করে দেখা যায়না 'গবেষক' ও 'গল্পকার'-তাগিদকে।

কেটি গার্ডনার দেখেন তাঁর গবেষিত এলাকায় হাসিনা নামের মেয়েটির বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, আর সে কাঁদছে। এলাকার মানুষজন বিশেষত মেয়েরা হাসিনাকে নিয়ে নানা রকম পুংখানুপুংখ গল্পে মেতে উঠছে। হাসিনার বিয়ের শাড়ী নিয়ে, অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে, হাসিনার কান্না নিয়ে (Gardner 1991:47) গার্ডনারের জানার ইচ্ছে হয় এরা কি হাসিনার জন্য দুঃখ পাচ্ছেনা ? যেহেতু এই মানুষজনের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে উঠেছে, তাই এ প্রশ্নটি তিনি করেই বসলেন। সুফিয়া, যার সাথে কেটির কথা হচ্ছিল , বলে 'কেটি তুমি বুঝতে পারছ না'। গার্ডনারের খেদোক্তি আমরা পাই ঠিক এর পরেই (পৃঃ৪৮)। কিভাবে যে আয়োজিত বিয়ে (arranged marriages) ভাল হতে পারে, কিভাবে যে কান্নাকে মহান মনে হতে পারে তা কিছুতেই গার্ডনারের মাথায় আসে না। শুধু তাই নয়, তিনি জানান সুফিয়াকে যে তাঁর নিজের দেশে মেয়েরাতো বিয়ের ঢের আগে হতেই হবু বরকে ভালবাসে। আর তাঁরাতো (কেটি গার্ডনাররা) বিয়ের সময় খুশী হন।

নিছক আপত্তি নয়, সমালোচনাটা - যা কেটি গার্ডনারের কাজের প্রতি রাখতেই হয়, তার গুরুত্ব সামাজিক বিজ্ঞানে এবং অবশ্যই নৃবিজ্ঞানে আরও ব্যাপক গভীর মনোযোগের দাবীদার। আয়োজিত বিয়ে আর প্রেমজ বিয়ের (love marriage) ডাইকোটমি যদি এতটাই প্রোথিত হয় চৈতন্যে তাহলে তো সমস্যা। কোর্টশিপের ধারণা যদি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলেতো সামাজিক বিজ্ঞান গোলক ধাঁধায় পড়বে।[৮] জিজ্ঞাসাটিকে ভিন্নভাবেও সাজানো যায়। তা হ'লঃ কোর্টশিপ বা প্রাক্-বিয়ে মেলামেশা কেনই বা গুরুত্বপূর্ণ? আয়োজিত আর প্রেমজ বিয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য করা সম্ভব কি ?[৯] কোন্ বিশেষ সমাজে, কোন্ বিশেষ

ঐতিহাসিক পরিসরে আয়োজিত বিয়ে আর প্রেমজ বিয়ে কী ধরনের লিঙ্গীয় সম্পর্ককে প্রকাশ করে, অনুশীলন করে সেটাই প্রধান জিজ্ঞাসা।[১০] এটি একটি দিক যা উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা হ'ল, কারণ উদাহরণ হিসেবে এটি স্পষ্ট। 'নদীপ্রান্তে সঙ্গীতমালা' এমন এক নৈপুণ্যময় গাঁথাগ্রন্থ যার বর্ণনারীতি আকর্ষণীয় এবং একই সাথে ধ্রুপদী নৃবিজ্ঞানের স্মারক। প্রত্যক্ষণলব্ধ বর্ণনাকে ধ্রুপদী নৃবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়ে আসছে এ শতকের গোড়া হতেই। ম্যালিনোস্কী, র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন, এমন কি ভেবে দেখলে বলা যায় ফ্রাঞ্জ বোয়াসও এই ধারাকে শক্তিশালী করবার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা রেখে গেছেন। এই ধারায় নৃবিজ্ঞানীর অনিবার্য দায়িত্ব যে শুধু প্রত্যক্ষণলব্ধ বর্ণনা করা তাই নয়, বরং যথা সম্ভব বিশ্লেষণহীন থাকা। কেটি গার্ডনারের বর্ণনায় হাসিনার বিয়ে ছাড়াও রোকেয়ার শাড়ী কেনা, উচ্চকণ্ঠী বানেসার গ্রাম্যগীত পরিবেশন, আলিম উল্লাহর সৌদীতে গমন, ভূত-প্রেতের কাহিনী, আবুল হোসেনকে জ্বিনে ধরা ইত্যাদি নানান বিষয় এসেছে। স্পষ্টতঃই এ সব বিষয়ের 'নিরপেক্ষ' বর্ণনা তাঁর লেখায়। সমাজে নারীদের অবস্হান বিষয়ে প্রেমজ বিয়ে এবং আয়োজিত বিয়েকে তিনি যেমন বিপ্রতীপ করে দেখেন, সেরকম নির্দিষ্ট (পূর্বানুমিতও বটে) ধারণা তাঁর আপাদমস্তক লেখার একটা বৈশিষ্ট্য। বিশ্লেষণহীন 'নিরপেক্ষ' বর্ণনা তাই কতকগুলো নির্দিষ্ট রূপনির্মাণ করেছে সেখানে এবং সচরাচর করে থাকে। রূপনির্মাণ গুলো গৎবাঁধা যার সাথে পশ্চিমা পাঠকসত্তা পরিচিত এবং যেগুলো সেই পাঠকের কাছে প্রত্যাশিতও।

ইমেজের এই রাজনীতি সারা হোয়াইট খানিকটা ধরতে চেয়েছিলেন (White 1992)। তাঁর ভাবনা ছিল গবেষণা লেখালেখিতে বাংলাদেশের নারীর উপস্হাপন বিষয়ে। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, গোটাকতক মাত্র রূপ নির্মাণ ঘটে থাকে এইসব কাজে। ভিক্ষারত নারী কিংবা পর্দানশীন নারী কিংবা কর্মজীবী নারী। এই নারীসমূহকেই গবেষণার মধ্য দিয়ে পুনরাবিষ্কার করা হয়ে থাকে। সারা হোয়াইট তার বাইরে থাকতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গজদের অঙ্গজ বিদ্যা

গ্রামসি যাঁদেরকে চিহ্নিত করেছিল অর্গানিক বা যৌগ বুদ্ধিজীবী হিসেবে তাঁদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জুড়ি মেলানো (Gramsci 1971)।[১১] চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ, অনুভূতি ইত্যাদির বেলায় যে ধরনগুলো প্রবল এবং প্রধান সেগুলোর দ্রুত আত্তীকরণ ছাড়াও এই বুদ্ধিজীবীদের কাজ হচ্ছে নিজ নিজ পরিসরে ও পর্যায়ে সেগুলোকে বোধগম্যভাবে সংবহিত করা, করতে থাকা। বোধগম্যতা এখানে, গ্রামসিয় চিন্তায়, সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষজনের সাধারণ বুদ্ধিতে (common sense) আশ্রয় করতে পারাকেই বোঝানো হয়ে থাকে । স্পষ্টতঃই সামাজিক বিজ্ঞানের মত বিষয়ে অর্গানিক বা যৌগ বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা খানিকটা স্বতন্ত্র। তত্ত্ব, প্রত্যয়, যুক্তি, ক্যাটেগরি নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁরা সে কাজটিই করেন যা হেজেমনিক ভূমিকায় সক্রিয় বুদ্ধিজীবীদের কাজের সমার্থক।[১২]

আলজেরিয়ার নারীবাদী মার্নিয়া লাজরেগ সমস্যাটিকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করেছে (Lazreg 1988)। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ, উত্তর আফ্রিকার একটি দেশ আলজেরিয়ায় বসে নারীবাদী হিসেবে কাজ করবার সমস্যা সেটি। ওর মতে মাগরিবি সমাজের নারীদের নিয়ে পশ্চিমা লেখিকারা, যাঁরা সকলে নারীবাদী তারও কোন নিশ্চয়তা নেই, যে সব ধ্যান ধারণা পোষণ করেন সেগুলোকে অভ্রান্ত এবং অপরিহার্য করে দেখা হয়। আলজেরিয়ার নারীবাদীদের কাজেও সেই চিন্তা-ভাবনা, তত্ত্ব-যুক্তির প্রতিধ্বণি পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, কখনও কখনও ফরাসী উপনিবেশের স্বরের সাথেও এর মিল। মিল পাওয়া যায় উপনিবেশ যুগের ফরাসী নারীর ভাষ্যের সাথে বর্তমান ফরাসী নারীর কিংবা সাম্প্রতিক মার্কিন নারীবাদীর ভাষ্য। বলাই বাহুল্য সেগুলো আলজেরিয়ার নারী নিয়ে এবং আলজেরিয়ার নারীবাদীরা সেগুলো আত্মস্থ করে নিয়েছেন। লাজরেগের দুর্ভাবনা সেখানেই (Lazreg ১৯৮৮)।

নিজ গবেষকের পশ্চিমা দেখার প্রক্রিয়ার সমস্যাটি গভীর। বিস্তর উদাহরণ এই প্রক্রিয়ার। বাংলা একাডেমী ১৯৯৫ সালে 'নৃবিজ্ঞান ঃ উদ্ভব বিকাশ ও গবেষণাপদ্ধতি' নামে একটি বই প্রকাশ করেছে (চৌধুরী ও রশীদ ১৯৯৫)। বইটির ভূমিকাতে (পৃষ্ঠা নম্বর বিহীন) লেখকদ্বয় এক জায়গাতে বলছেন ''বাংলাদেশের মতো অনুন্নত, সনাতনী ও ঐতিহ্যনির্ভর সমাজ সমূহের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্যের অধ্যয়ন, বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান এবং যথার্থ তথ্যনির্ভর গবেষণায় নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য।'' উদ্ধৃত অংশটির বেশ কয়েকটি ধারণা মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমনঃ 'অনুন্নত', 'সনাতনী', 'ঐতিহ্যনির্ভর', 'সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্য', 'বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধান' ইত্যাদি। এই ধারণাগুলো বাংলাদেশ কিংবা তৃতীয় বিশ্বের বহুদেশেরই সমাজ সম্পর্কে এবং নৃবিজ্ঞান সম্পর্কে ইতোমধ্যেই তৈরী হয়ে আছে। এই ধারণা গুলোকেই ভিত্তি করে প্রচুর পশ্চিমা গবেষণা কাজ চলেছে ; যদিও বলা হয়ে থাকে 'বস্তুনিষ্ঠ' গবেষণায় কোন পূর্ব ধারণা থাকে না। যদি বিতর্কের স্বার্থে ধরেও নিই যে কোন পূর্বধারণা কাজ করছেনা এ সকল গড়পরতা গবেষণায়, তাহলেও দেখা যাচ্ছে উত্তর-ধারণা অর্থাৎ গবেষণা-উত্তর উপলব্ধি হিসেবে কিন্তু এই সকল চিন্তা, প্রত্যয়ই উৎপাদিত হচ্ছে। কারো প্রশ্ন হতে পারে, পশ্চিমা গবেষণা আর পশ্চিমা ফর্মুলা ধাঁচের গবেষণা মানেই পরিত্যাজ্য কিনা। স্পষ্টতঃই, এত সিধে সরল প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন সম্ভব নয়। যে জিজ্ঞাসাটিতে আমাদের মনোযোগ দিতেই হবে তা হচ্ছে ঃ কিভাবে এবং কেন এত দীর্ঘকাল ধরে কোন একটি সমাজ সম্পর্কে এই একই ধরনের ধারণা সামাজিক বিজ্ঞানে অনুশীলিত হচ্ছে। একটু খোলাসা করা যেতে পারে। উপনিবেশের সময়কালে ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য উপনিবেশিত এলাকা সম্পর্কে এই বিশ্লেষণ (নাকি মতামত?) ছিল পশ্চিমের এবং পশ্চিমা প্রকল্পে[১৩] নিয়োজিত অপশ্চিমা গবেষকগণের। প্রাক্-উপনিবেশ সম্পর্কেও এই একই ধারণা। আবার উপনিবেশ-উত্তর কালে এতটা সময় পরেও ধারণা কিছুমাত্র ভিন্ন নয়, ভিন্ন

কোন প্রত্যয় গড়পরতা সামাজিক বিজ্ঞান পয়দা করছেনা। অনুন্নয়ন, সনাতনী অবস্হা, ঐতিহ্যনির্ভরতার কোন বদল ঘটেনি সেটা প্রায় অসম্ভব। আর কিছু বাদ দিলেও সামাজিক বিজ্ঞানীরা, নৃবিজ্ঞানীরা উপনিবেশের মত বিরাট বিষয়টা তাহলে কিভাবে বুঝবেন?

এটি পর্যালোচনা লেখা নয়। পর্যালোচনা লেখা হলে আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এবং সাইফুর রশীদ লিখিত বইখানি সম্পর্কে কিছুটা দীর্ঘ পরিসরে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল । কিন্তু, যে বিষয়ে এই লেখাটা আবর্তিত তাতে কিছুটা উল্লেখ করা জরুরী আলোচ্য বইটি হতে। বইটি আদ্যোপান্ত প্রতিষ্ঠিত প্রধান ধারার নৃবিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞানের উপলব্ধি দিয়ে গড়া। তাই, প্রথম অধ্যায়ের 'খ' অংশে (নৃতাত্ত্বিক গবেষণাঃ ক্ষেত্র ও পরিধি) যখন পশ্চিম, উপনিবেশ এবং সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে ক্যালভার্টন এবং ক্যাথলিন গফের উদ্ধৃতি দেখি তখন চমকে যেতে হয়। লেখকদ্বয় ক্যালভার্টন (Calverton) হতে উদ্ধৃতি দেন ''নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় ... এই সমস্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উপর পশ্চিমাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মানসিকতাই এক্ষেত্রে বেশি কাজ করেছে'' (চৌধুরী ও রশীদ ১৯৯৫: ১৫)। গফের (Gough) চিন্তা হতে লেখকরা তুলে ধরছেন যে নৃবিজ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে -- ''পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের শিশুর জন্মলাভ'' (পূর্বোক্ত: ১৫)। লেখকদের নিজেদেরও মনে হয়েছে যে, পশ্চিমা দেশসমূহের বাইরে নৃবিজ্ঞানের গবেষণা দীর্ঘকাল ধরে হবার ''পেছনে যতটা না একাডেমিক প্রয়োজন বা আগ্রহ কাজ করেছে তার চেয়ে বেশি কাজ করেছে ঐ সমস্ত সমাজ অনাবিষ্কৃত এবং অনুন্নত এই যুক্তিতেই অবশ্য এর সাথে যুক্ত হয়েছে আদর্শিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় স্বার্থের মতো বিষয়সমূহও'' (পূর্বোক্ত: ১৬)। কিন্তু, এই বক্তব্য কোন ধরনের রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক গুরুত্ব তৈরী করতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ অবস্হান হতে চিন্তাপ্রক্রিয়া গড়ে উঠেছে লেখকদ্বয়ের, বলাই বাহুল্য প্রবল ঢঙের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমা প্যাকেজ জ্ঞানের চিন্তাপ্রক্রিয়া, যার সাথে ঐ বক্তব্য কিংবা ক্যালভার্টন - গফের উদ্ধৃতি নিরর্থকভাবে সংযোজিত।

অল্প কিছু পরেই লেখকদ্বয় লেভীস্ট্রসের উদ্ধৃতিকে তুলে ধরেন। ''আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, পলিনেশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণার পেছনে শুধু রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিক মনোভাব কাজ করছে এটা মনে করা ঠিক নয়'' (পূর্বোক্ত:২৩)। গবেষণায় ঔপনিবেশিক মনোভাব কাজ করেছে কি করেনি সেসব বিতর্ক অপ্রয়োজনীয়। বিষয়টা মনোভাবের নয়। একটা বিশেষ জ্ঞানকাণ্ড যে চিন্তাপদ্ধতি দাঁড় করাচ্ছে সেটাকে চিহ্নিত করার প্রসঙ্গ এটা। যা হোক, এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমকে একটা 'অরাজনৈতিক ক্যাটেগরি' নির্মানের প্রস্তুতি নিয়েছেন লেখকদ্বয়। সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের কাছে পশ্চিম ও অপশ্চিমের ফারাক মূল্যবোধ জর্জরিত। অপশ্চিমে বেশী গবেষণা পরিচালিত হয়েছে বোঝাতে গিয়ে তাঁরা লিখলেন......... ''নৃবিজ্ঞানের গবেষণা শুধু অন্ধকার জগতকে নিয়েই পরিচালিত হয়েছে। আলোকময় জগতের জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির দিকে

মোটেও দৃষ্টি দেয়া হয়নি'' (পূর্বোক্ত:১৭)। এই অংশে 'অন্ধকার', 'আলো' এবং 'মোটেই' কথাগুলো বিশ্লেষণযোগ্য। এর থেকে মনে হতে পারে 'আলোকময়রা' বঞ্চিত হচ্ছে। তাঁরা লিখলেনও বটে, ''নৃবিজ্ঞানের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, কখনোই নির্দিষ্ট কোনো সমাজের উপর একপেশে গবেষণা হতে পারে না। ... সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নৃবিজ্ঞানীদের কাছে অগ্রসর কিংবা অনগ্রসর এটা কোনো বিবেচনা হতে পারে না'' (পূর্বোক্ত:২১-২২)। চূড়ান্ত বিচারে নৃবিজ্ঞান চর্চার রাস্তাগুলো দাঁড়ায় সেই পরিচিত পশ্চিমা পয়দা করা জ্ঞানভান্ডার ঘিরেই। সেটা স্পষ্ট হয় যখন লেখকদ্বয় সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে অধ্যাপক আমিনুল ইসলামকে উদ্ধৃত করেনঃ ''আজকের মানববিজ্ঞানী শুধু গ্রাম্য, বর্ণ, অর্ধনগ্ন, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত জংলি, কোল, ভীল, নাগা, সাঁওতাল জাতীয় সম্প্রদায়কেই নিয়েই তাঁদের গবেষণায় মগ্ন নন। (... শুধু তাদের নিয়েই এই পৃথিবী নয়।)'' ''অত্যুজ্জ্বল জগতের ঐশ্বর্য, বিস্তৃতি, নগর জীবনের বিভিন্ন উপাদানে গঠিত জটিল পরিবেশ যখন গ্রামের অধিবাসীদের আকৃষ্ট করল, আর আদিম কালের জীবনে অভ্যস্ত মানুষ যখন জীবনের চাকচিক্যে বিমোহিত হয়ে পতঙ্গের মতো নগররূপী প্রদীপ শিখার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, মানব বিজ্ঞানীরাও তখন নাগরিক মানুষের জীবনযাত্রার রূপ সন্ধানে নিয়োজিত হতে বাধ্য হলো'' (চৌধুরী ও রশীদ, পূর্বোক্ত:৩১)।[১৪] পশ্চিমের চোখে এই দেখাটা অনৈতিহাসিক, অরাজনৈতিক এবং নিপীড়ক। এর আরো উদাহরণ পাই।[১৫]

এই চোখে তৃতীয় বিশ্বের সমাজের পরিচিতি হচ্ছে মূলতঃ 'প্রথাগত' বা 'ঐতিহ্যনির্ভর' বা 'চিরায়ত' । এই মানগুলো তৈরী হয়েছে 'সংস্কৃতি'র ধারণার মধ্য দিয়ে। নৃবিজ্ঞান জ্ঞানকান্ডের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিই যে ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে তা অজানা নয়। যেটা প্রয়োজন তা হ'ল ঃ সংস্কৃতি ধারণা যে নির্ধারণবাদী তা উপলব্ধি করা। সংস্কৃতির ধারণা, এমনকি নৃবিজ্ঞানীদের চিন্তার কথাই হচ্ছে, নির্ধারণ বাদী অর্থ হচ্ছে - ধরে নেয়া হয় সংস্কৃতি মানুষকে গড়ে পিঠে দেয়। অ আ ক খ গোছের নৃবিজ্ঞান পুস্তক হতে শুরু করে প্রধান ধারার নৃবিজ্ঞান লেখালেখির মধ্যে সংস্কৃতির প্রবল যে ধারণা পাই তা নির্ধারকের ভূমিকা রাখে।[১৬] এতে যে সমস্যাটার কথা সর্বাগ্রেই বলা চলে তা হচ্ছে এক কালহীন গহ্বরে পতন। প্রথাগততা যদি সাংস্কৃতিক মান হয় তাহলে পিছিয়ে থাকাটা সাংস্কৃতিক ফলাফল। রূপান্তর বা বদল বুঝতে এই মানদন্ড কোন রাস্তা বাৎলায়না বরং রুদ্ধ করে দেয়।

কিন্তু, রূপান্তরতো হচ্ছে ঃ উপসংহার

কোন সমাজকে যদি গতিশীল বলা হয় তাহলে সাংস্কৃতিক মান খুব একটা কাজ করেনা। যদি করেও, ধরে নেয়া হয় ঐ সমাজের সংস্কৃতির পুনরুৎপাদন ক্ষমতা প্রচুর। 'গতিশীল' কোন একটা সমাজ দশ বছর আগে যা ছিল তা হতে বদলেছে সেটাই স্বাভাবিক ধরে নেয়া হয়। অন্ততঃ কিছু একটা পথ সেখানে খোলে। পক্ষান্তরে, 'প্রথাগত', 'ঐতিহ্যবাহী' সমাজের অনুন্নয়নের দায়ভাগ গিয়ে পড়ে 'প্রথা'র উপর, 'ঐতিহ্যে'র ওপর। এ এক চোরা ফাঁদ। সেই ফাঁদে পা দিই আমরা অনেকেই অপশ্চিমের নৃবিজ্ঞানীরা। ফাঁদটা রাজনৈতিক। জ্ঞানের রাজনীতি, বৈশ্বিক বস্তুগত সম্পর্কের রাজনীতি। রাজনীতিটা ঐতিহাসিক। নৃবিজ্ঞানী হিসেবে পুনঃপৌনিকীকরণের দায়িত্ব হতে যত দ্রুত গা ঝাড়া দিতে পারি আমরা ততই মঙ্গল। রূপান্তর বোঝাও নৃবিজ্ঞানীদের দায়িত্ব।[১৭]

টীকা

১. এ ব্যাপারে যে কাজটিকে যুগসূচনাকারী হিসেবে দেখা হয় তা হ'ল তালাল আসাদ সম্পাদিত *Anthropology & the Colonial Ecounter* (Asad 1973)। পূর্বসূরী বেশ কিছু নৃবিজ্ঞানীর (যেমন ক্যাথলিন গফ) কাজের সূত্র ধরে একটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি দাঁড়াল এই প্রকাশনার মধ্য দিয়ে । উত্তরকালের নৃবিজ্ঞানীদের উপলব্ধিতে এই বইটির ভূমিকা অপরিসীম।

২. ভারতবর্ষের উৎপাদন পদ্ধতির উপর বলতে গিয়ে ফ্রাঙ্ক এবং লাকলাউয়ের চিন্তার দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে হামজা আলাভী (Alavi 1975), যার চিন্তাকে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে জাহাঙ্গীরও (১৯৯৭)।

৩. ধারণাটি বিস্তৃত হচ্ছে তালাল আসাদের *Genealogies of Religion* বইয়ের ভূমিকায় (Asad 1993)।

৪. '৫০-'৬০ এর দশকে লেখা ইতালীয় ভাষার লেখক আম্বার্তো ইকোর প্রহসনধর্মী লেখাগুলোর সংকলন বেরোয় ১৯৬৩ সালে। ইংরেজীতে এর অনুবাদ 'Misreadings' নামে বেরোয় ১৯৯৩ তে। ইকোর নিজের মনে হয়েছে যে উত্তরকালের বিনির্মাণকারী লেখালেখি (decoustructive reading) প্রেরণা পেয়েছে অনেকটাই তার লেখা হতে।

৫. সেমিওটিকসের অধ্যাপক। ওর পরিচয় দেয়া হয় দার্শনিক, ইতিহাসবিদ, সাহিত্য-সমালোচক এবং নন্দনতত্ত্ববিদ হিসেবে।

৬. একটা উদাহরণ দেয়া যাক। ৮০'র দশকের সাঝামাঝি হতেই বাংলাদেশে গবেষণা জগতে 'নারী' খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এখনও এর গুরুত্ব খুব হারায়নি, বরং অনেক বেড়ে গেছে। পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গী বাংলাদেশের নারীদের সমস্যা চিনতে গিয়ে পর্দাপ্রথা এবং 'রক্ষণশীল' ইসলামকে ঢালাওভাবে প্রধান বলে ভেবেছে। বাংলাদেশের গবেষকদের কাছেও কিন্তু নারী প্রশ্ন অনুধাবনে গড় পড়তায় ঐ ধারণাগুলো (পর্দা বা রক্ষণশীলতা) সমানভাবে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। তাই বাদ পড়ে গেছে লিঙ্গীয় সম্পর্কের জটিল দিকগুলি। আলজেরিয়ার নারীবাদী মার্নিয়া লাজরেগ বিষয়টিকে অনেক স্পষ্ট করে খোলাসা করেছে (Lazreg ১৯৮৮)।

৭. কেটি গার্ডনারের যে বইটি নিয়ে এই অনুচ্ছেদের শিরোনাম, সেটা হচ্ছে *Songs at the River's Edge* (Gardner 1991)। বইটির মুখবন্ধের একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলছেন যে অবশ্যই তিনি এই লেখায় 'সাবজেক্টিভ' এবং গ্রামের লোকের হয়ে কিছু বলা তাঁর সম্ভব হয়নি। তাদের (গ্রামের লোকজন) অবশ্যই সবকিছু নিয়ে নিজস্ব ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকতে পারে।

কিন্তু তিনি (গার্ডনার) চেষ্টা করেছেন 'বাস্তবতা'র খুব কাছাকাছি বর্ণনা করতে। সেরকমটাই বলছেন তিনি মুখবন্ধে। বইটির পরিচ্ছেদগুলো হচ্ছেঃ 1. September – Arrival 2. The lives that Allah gives 3. Hushina gets married 4. A woman's place 5. The lives that Allah takes 6. Roukea buys a new sari 7. Stories of the spirits 8. Storms 9. Abudullah seeks a cure 10. Alimullah goes to Saudi 11. Ambia's story 12. November – Departure

৮. কোর্টশিপের বাংলা করা যেতে পারে প্রাক্ বিয়ে মেলামেশা। কিন্তু, স্পষ্টতই খুবই ঐতিহাসিক স্থানিক বিষয় এটা। সে কারণেই রেহনুমা আহমেদের সাথে আমার যৌথ লেখায় এটার বাংলা করিনি (চৌধুরী ও আহমেদ ১৯৯৭)। সেখানে উল্লেখ করেছিলাম যে ডেভিডফ ও হলের কাজে কোর্টশিপ ধারণাটির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আছে (Davidoff & Hall ১৯৮৭)।

৯. এ প্রসঙ্গে বালমূর্তি নটরাজন (Natarajan 1997) একটি ব্যাঙ্গাত্মক লেখা লিখেছেন।

১০. এ প্রসঙ্গে আমার অবস্থান আগেই প্রকাশ পেয়েছে (চৌধুরী ও আহমেদ ১৯৯৭:২৫)।

১১. অর্গানিক বুদ্ধিজীবীদের কেন যৌগ বলি তার একটা ব্যাখ্যা পূর্বোক্ত লেখায় দিয়েছি (চৌধুরী ও আহমেদ ১৯৯৭:৩৩)। সেখানে 'অঙ্গীয়' বাদ দেবার কথা বলেছিলাম। এখানে, বর্তমান লেখায় বিশেষ অর্থে 'অঙ্গজ' (অঙ্গে জন্মে যাহা, সেই সূত্রে ছত্রাক বা পরজীবী ইত্যাদি) ব্যবহার করার তাগিদ পেলাম।

১২. 'হেজেমনি' গ্রামসির চিন্তাধারাতেই ব্যবহৃত এখানে। এর দ্বারা যাঁরা শারীরিক বল বা আধিপত্য বোঝেন, তাঁদের সাথে কোন একাত্মতা নেই এই উল্লেখে।

১৩. প্রকল্প (project) ধারণা সাম্প্রতিক লেখালেখিতে খুবই জটিল ধরনের ব্যাখ্যা পাচ্ছে। আমার মনে হয়েছে, হেজেমনিক প্রক্রিয়ার সাথে এর একটা যোগাযোগ আছে। এ ধারণাও তালাল আসাদের *Genealogies of Religion* বইতে পাওয়া যাবে।

১৪. আমিনুল ইসলামের 'ইন্ডিয়ানা জোন্‌স' গোছের এই ফ্যান্টাসী নিয়ে অনেক কিছু বলার প্রয়োজন দেখিনা।

১৫. অধ্যাপক এস, এম, নুরুল আলমের লেখায় পাই ''বাংলাদেশ একটি সংরক্ষণবাদী, কৃষিভিত্তিক উন্নয়নগামী দেশ। এখানে মূল্যবোধ, গোঁড়ামী, বিশ্বাস ব্যবস্থা ও ধর্মের সাথে জড়িত বিভিন্ন ট্যাবু অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে'' (আলম ১৯৯১)। পশ্চিমা প্যাকেজ জ্ঞানকে ভিত্তি করেই বাংলাদেশের দিকে দৃকপাত করা হচ্ছে এখানে। অন্যত্র পশ্চিমা নৃবিজ্ঞানীদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁদের কাজকে অনেক বড় করে দেখেছেন। ''...... অনেক এলাকায় নৃবিজ্ঞানীরা উপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের চর, বিদেশী চর ইত্যাদি হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও নৃবিজ্ঞানীরা পিছিয়ে যাননি। তারা সমস্ত চাপের মুখে, ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে অজানাকে জানার নেশায় কাজ চালিয়ে গিয়েছেন'' (আলম ১৯৮৭)।

১৬. 'কালচার ইজ লার্নড, কালচার ইজ শেয়ারড, কালচার ইজ ট্রান্সমিটেড' ইত্যাদি ধারণাগুলো সংস্কৃতিকে নির্ধারকের জায়গাই দেয়। সনাতন নৃবিজ্ঞানে এই ধারণা মৌলিক একেবারে। শুধুমাত্র 'রিপ্রেসেন্টেশন' এর ধারণা নিয়ে এগুলেও কিছু স্থবিরতা মুক্তি পেত বলে মনে করি। কারণ এর মধ্যে ক্ষমতা বৈষম্যের একটা দিক্ নির্দেশনা আছে। এতে সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় কর্তাসত্তার প্রশ্ন চলে আসে। আগের গুলোয় যা আসে না।

১৭. কারো কারো মনে হতে পারে, রূপান্তর দেখার মত গবেষণা কাজতো হচ্ছে। 'ক্ষুদ্র ঋণ নেবার পর ঘর-গেরস্থালীতে কী ধরনের পরিবর্তন আসছে' অথবা 'শিল্প প্রযুক্তি আসবার ফলে গ্রামবাসীদের কী সুবিধা-অসুবিধা হচ্ছে' - এ ধরনের কাজকে একই গুরুত্বের ভাবার মানে হয়না। রূপান্তর বলতে এখানে ঐতিহাসিক অর্থে, ক্ষমতা-আধিপত্যের মধ্যেকার ব্যবস্থা অর্থে, বৈষম্যের সম্পর্কের অর্থে বোঝানো হচ্ছে। অনেকেরই জানা, হ্যাঁ, 'দ্বন্দ্ব' সেখানে গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা।

তথ্যসূত্র

আলম, এস, এম, নুরুল (১৯৮৭) নিজ সমাজে ফিল্ডওয়ার্কে সমস্যা ও দ্বন্দ্বঃ একটি ব্যক্তিগত মূল্যায়ন। *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* সংখ্যা ১

------(১৯৯১) বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞান চর্চাঃ প্রয়োজন ও সম্ভাবনা, *নৃবিজ্ঞান পত্রিকা,* সংখ্যা ২

চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ্ ও সাইফুর রশীদ (১৯৯৫) *নৃবিজ্ঞানঃ উদ্ভব বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি,* ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী, মানস ও রেহনুমা আহমেদ (১৯৯৭) লিঙ্গ, শ্রেণী এবং অনুবাদের ক্ষমতাঃ বাঙ্গালী মুসলমান বধ্যবিত্ত পরিবার ও বিয়ে। *সমাজ নিরীক্ষণ,* সংখ্যা ৬৩

জাহাঙ্গীর, বোরহানউদ্দিন খান (১৯৯৭) *বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল ও শ্রেণী সংগ্রাম* (২য় সংস্করণ). ঢাকাঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

Alavi, H. (1975) India and the Colonial Mode of Production. *The Socialist Register* []

Asad, T., ed. (1973) *Anthropology and the Colonial Encounter.* New York: Humanities Press.

------(1993) *Genealogies of Religion.* Baltimore: John Hopkins Univ Press

Eco, U. (1993) *Misreadings.* []

Gardner, K. (1991) *Songs at the River's Edge.* Dhaka: UPL

Gramsci, A. (1971) *Selections from the Prison Notebooks.* [Tr.] New York: International Publishers.

Lazreg, M. (1988) Feminism and Difference: The Perils of Writing as a Woman in Algeria. In *Conflicts in Feminism* []

Malinowski, B. (1967) *A Diary in the Strict sense of the Term.* New York: Harcourt, Brace & World.

Natarajan, B. (1997) Notes Towards a (Re) Arrangement of Love. *SAMAR*, No. 8 (Summer/Fall)

White, S. (1992) *Arguing with the Crocodile.* Dhaka: UPL.